মঞ্চচিত্রণের নান্দনিকতা

শেখর সমাদ্দার

ইংরেজিতে সাধারণত যাকে ‘ব্দব্ধ্রব্দন্দ্ব ন্তব্জ্রন্দ্রব্ধ’ বা ‘ব্দব্ধ্রব্দন্দ্ব ড্ডন্দ্বন্তুপ্সব্জ’ বলা হয়, বাংলায় তাকে আমরা ‘মঞ্চসজ্জা’ বা ‘মঞ্চস্থাপত্য’ বলে অভ্যস্ত। কিন্তু এই দুটি চালু শব্দের প্রথমটি সর্বৈব ভুল, কেননা থিয়েটার . একটি সংযুক্ত বা Composite শিল্প, মঞ্চ, আলো, রূপ ারোপের ভূমিকা সেখানে গোড়া থেকেই গুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং এরা কখনোই নিছক সজ্জা নয়। স্থাপত্য কথাটি অবশ্য অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে, কেননা গোড়ার যুগে রঙ্গমঞ্চের গঠন ও তার বিবর্তন স্থাপত্যকলারই অন্তর্গত ছিল। আজ আমরা যে প্রসিনিয়ম মঞ্চের চেহারা দেখছি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক নাট্যকলার চেহারা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা এসেছে। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির প ারমা শহরের কারনিস থিয়েটারের মঞ্চস্থপতি গিয়ামবাতিস্তা আলিওত্তি এই প্রসিনিয়মের চেহারাটি তৈরি করেন। কিন্তু তার প্রায় দুশো বছর আগেই সেখানে দৃশ্যপট এসেছে১। ইতালির মানবতাবাদী সমাজ চেয়েছিলেন ক্ল্যাসিকে’র পুনর্নির্মাণ, যা কিনা রেনেশাঁসের বিশেষ ধর্ম। ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে ফেরেরায় অনুষ্ঠিত হল এক অভিনয়--যেখানে অভিনয়ের স্থানকে একটু বড়ো করবার জন্য ব্যবহৃত হল ‘ত্নন্দ্বজ্বব্দন্মান্দ্বন্তুব্ধন্লন্দ্ব’ বা দূরত্ব - ঘনত্বসূচক দৃশ্যাঙ্কন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা রাফায়েলের মতো শিল্পীরা এই ধরনের দৃশ্যাঙ্কনে উৎসাহী হন। বিশেষত শিল্পী ব্রামান্ট মিলান শহরের এক গীর্জায় অভিনয়ের জন্য এই ধরনের চিত্রাঙ্কন করেন। এই প্রকল্পে তাঁর সহায়ক ছিল বিটরাভিয়াসের (খ্রি পূ ৭০-১৫) লেখা স্থাপত্য বিষয়ক রচনা। সাবাস্তিয়ানো সারলিও (১৪৭৫ - ১৫৫৪ খ্রি) নামে ভিটরাভিয়াসের অনুগামী এক শিল্পী ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এক যুবরাজের ব্যাঙ্কোয়েট হলকে মাথায় রেখে ‘পারস্পেকটিভ’ অনুযায়ী তিন ধরনের মঞ্চের দৃশ্য পরিকল্পনা করলেন তাঁর সুখ্যাত‘দ্য আর্কিটেক্চারা’ গ্রন্থে। এই নির্দেশ অনুযায়ী বার্তোলোমিও নেরে ানি (১৫০০-১৫৭১) সিয়েনা শহরে সেনেট হলের সামনে একটি বড়ো হলে প্রসিনিয়ম তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্য রচনা করলেন।২

আলিওত্তি যে প্রসিনিয়ম মঞ্চব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলে মঞ্চের সামনের দিকে কিছুটা অংশ জুড়েএকটা ছবির ফ্রেমে-র উদ্ভব ঘটে। সেই ফ্রেম - কে ঢাকবার জন্য আসে পর্দা (Curtain)। এইখান থেকে যে পিকচারফ্রেম মঞ্চের চেহারা তৈরি হল, ইংলণ্ডে রেস্টে ারেশন যুগের কমেডি - চর্চায় সেই মঞ্চই অত্যধিক চালু হয়ে উঠল। এ ব্যাপারে প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন ইনিগো জোনস্ (১৫৭৩ - ১৬৫২), মঞ্চস্থাপত্যের ইতিহাসে যাঁর নাম সবিশেষ গুত্ব পেয়ে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি বহুবার ইতালি এবং ডেনম ার্কে গিয়ে শিক্ষানবিশি করে, যুবরাজ হেনরির ঘনিষ্ঠ হন এবং দেশে ফিরে তিনি ইংলণ্ডের কোর্টমাস্ক্ বা সঙ্জাতীয় প্রহসনের শিল্পগত পরিচালক হয়ে ওঠেন। রাজতন্ত্র তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করে। তার আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে খোলা স্টেজে-ই অভিনয় হত, শেকসপিয়ার পর্যন্ত তাঁর থিয়েটারে মঞ্চের পিছনে সীন ব্যবহার করতেন। গোটা মঞ্চে যে পরিবেবেশ ফুটে ওঠা ইচিত, তা কেবল তাঁর রচনাতেই থেকে যেত। কিন্তু জোনস্ ইতালীর পদ্ধতিতে ওপরে ঝালর ঝোলালেন, দু-পাশে চারটি করে উইংস বা বর্ডার দিলেন। ইতিমধ্যে রোমে ক্ষমতাসীন বারবেরিনি পরিবারের উৎসাহে অপেরা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল, তিন হাজার দর্শক - বিশিষ্ট মঞ্চ তৈরি হতে লাগল এবং আলিওত্তির ছাত্র গিয়াকোমা টরেলি (১৬০৮ - ১৬৭৮)-র মতো শিল্পীরা পেশাদার দৃশ্যপট রচয়িতা হয়ে উঠলেন। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের ফলে এই সময়ে মঞ্চের বিবর্তন ঈষৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। টরেলি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সমতল প ারস্পেক্টিভ দৃশ্য রচনা করে স্তম্ভ ও খিলান আঁকছিলেন, বদলে দিচ্ছিলেন পশ্চাদ্পটও। ইংলণ্ডে আবার নতুন করে যখন থিয়েটার শুহল, তখন এলিজাবেথীয় মঞ্চরীতি নতুন আঙ্গিকে চলে এল। মঞ্চের অ্যাপ্রন অংশটি প্রসিনিয়মের বাইরে বেরিয়েএল, প্রসিনিয়ম আর্চ - কে কাকার্যময় করা হল। একদিকে ইংরেজি নাট্যশালা, অন্যদিকে ইতালীয় অপেরার প্রভাবে ফ্রান্স বা জার্মানির নাট্যক্ষেত্র অষ্টাদশ শত াব্দী পর্যন্ত এইভাবেই চলেছে। এই শতাব্দীতে এসে মঞ্চস্থাপত্যের পদ্ধতি বদলাতে শু করল। রেনেশাঁসের যুগের পারিপাট্যকে বদলে দিলেন ফাদার অব বারোক (Baroque) মিকেলেঞ্জেলো। আকৃতি ও গঠনের প্রচলিত ধারণাগুলিকে তিনি ভেঙে দিলেন। মঞ্চের পিছনের দৃশ্যপটে বারোক যুগের বিস্তারিত স্থাপত্যশৈলীকে ধ্রুপদী নাট্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে করতে ক্লান্ত মঞ্চ নিসর্গচিত্রণের দিকে উৎসাহিত হতেথাকল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ফার্দিনান্দো গালি, গিয়াসেপ্পে গালি এঁরা দুজন মঞ্চে নিয়ে এলেন রোমান্টিসিজম্। তাঁরাভ াঙলেন ধ্রুপদী সুষমা। এই দুই রীতির বিরোধের মাঝখানে জঁ নিকোলাস সারভাদনি (১৬৯৫ - ১৭৬৬) গোটা য়ুরোপ ভ্রমণ করে প্রথা ভাঙতে লাগলেন। ইংলণ্ড নব্য - ধ্রুপদীয়ানাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল আগেই, এবার তারা পুরোপুরি রোমান্টিকতার দিকে চলে যেতে চাইল। ফিলিপ জেমস্ দ্য লুদরবার্গ (১৭৩৫ - ১৮১০) নামে এক জর্মন শিল্পী ১৭৭১ -এ এসে ইংলণ্ডে ড্রুরি লেনের ব্যবসায়িক

মঞ্চে নানান প্যান্টোমাইম ও বিনোদনাত্মক নাট্যে জ্যোৎস্না, আগুন, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি স্বচ্ছ দৃশ্য রচনা করলেন, ব্যবহার করলেন ক াট- আউট সিন। ইউলিয়ম কাপঁ (১৭৫৭ - ১৮২৭) নতুন করে শেকসপিয়ারের নাটকের মঞ্চায়নে নিয়ে এলেন অসংখ্য ফ্ল্যাট ও ব্য াকক্লথের ব্যবহার -- জর্জ কোলম্যানের লেখা দ আয়রন চেষ্ট -এর মতো ঐতিহাসিক নাটকেও তিনি দৃশ্যচিত্রণে অভিনবত্ব নিয়ে এলেন। ঊনবিংশ শতকের পৃথিবীতে বারোক ও রোমান্টিক মঞ্চস্থাপত্যের শেষ ঘন্টা শোনা গেল। কাটা কাপড়ের চিত্র, লেসের ঝালর, কাটা ক াগজের ছবি একঘেয়ে হয়ে এল কমেডি ও অপেরায়। সীরিয়াস সামাজিক নাটকে ফ্ল্যাটের সারি, দেয়ালের ছবি, দরজা জানালার ফ্রেম এমন কি আসবাবপত্রও আঁকা ছবিতে দেখতে দেখতে দর্শক বিরক্ত হয়ে উঠল। তিনটি দেয়াল ঘেরা এবং ছাদবিশিষ্ট বক্স্-সেট -এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আসবাবপত্র, দেয়াল জানালাকে সত্যিকারের বস্তুগত চেহারায় দেখতে চাইল দর্শকরা। বাস্তবতার এই চাপে মঞ্চে সত্যিকারের খাবার এবং খাওয়ার দৃশ্যও আমদানি হয়ে গেল উনিশ শতকে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আতোঁয়ান প্যারিসে গড়ে তোলেন থিয়েটার লিব্র। মঞ্চে স্বাভাবিকবাদের তিনি সুস্পষ্ট রূপ দেন। নাটকের ভাব অনুয যায়ী তিনি দৃশ্যচিত্র ও মঞ্চোপকরণের ব্যবহার করেন। কিন্তু এই বাস্তবতার অনুকৃতি নাটকের রচয়িতাকে কোনো কল্পনা ও উদ্ভাবনে সাহ ায্য করে না, বরং তাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখে দেয়। এই জন্য সংকেতবাদী কিছু তণ লেখক ও শিল্পী থিয়েটার লিব্র -এর বাস্তববাদী চলনকে অস্বীকার করেন। তারা মঞ্চচিত্রণকে সরল, সংকেতবাহী, বর্ণনামূলকতার বদলে উদ্ভাবনী কল্পনানির্ভর করে দেখাতে চাইলেন। সেখানে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ শৈলীর বিশিষ্ট রূপ, সেখানে দৃশ্য ও পোশাকের মধ্যে থাকবে বর্ণগত সৌষম্য এবং ঘনত্বসূচক পশ্চাদ্পট ব্যবহার সম্পূর্ণ বাদ যাবে। সংকেতবাদীদের কাজ দেখে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ বোধ করেছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের পরিচালক কনস্ত ানতিন স্তানিস্লাভ্স্কি (১৮৬৩ ১৯৩৮)। রাশিয়ার নাট্যকলাকে পুনর্জ্জীবিত করবার জন্য তিনি স্বভাববাদের প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খসহ জীবনের প্রকৃত রূপের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর থিয়েটার স্টার সিস্টেম বর্জন করল, অভিনেতারা অভিনয়ের কৃৎকৌশলে এমন এক ধরনের প ারফেক্শনিস্ট হয়ে উঠলেন যে তারা বাস্তবতার স্তর অতিক্রম করে এক সাংকেতিক ছন্দে উত্তীর্ণ হলেন। চেকভের নাটকগুলির অভিনয় ত ারই প্রমাণ হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে একজন ফরাসীভাষী সুইশ নাট্যব্যক্তিত্ব অ্যাডলফ্ আপ্পিয়া (১৮৬২ - ১৯২৮), যিনি ইতিপূর্বে হ্বাগন ারের থিয়েটারে কাজ করেছিলেন--তিনি দৃশ্যের সরলরৈখিকতা এবং অভিনেতার ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার দৃশ্যে ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তিনি বলতে চাইলেন, ভালো মঞ্চাভিনয়ের জন্য এমন দৃশ্যচিত্রণ করতে হবে, যা নমনীয়, যা অভিনেতার সকল মনোভাব, ভঙ্গি এবং শ্বাসের জগৎকে ধারণক্ষম হবে। অভিনেতার গঠনকে মুছে দেবার বদলে আলো অভিনেতার অস্তিত্বকে জোরালো করবে। হ্বাগনারের গীতিনাট্য ও শেকসপিয়ারের নাটকের প্রয়োজনায় তিনি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষিত সারল্য রচনা করলেন। আপ্পিয়ার পর প্রখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরির পুত্র এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ (১৮৭২ - ১৯৬৬)অপরিসীম ক্ষমতা নিয়ে থিয়েটারে এলেন। মায়ের অবৈধ এবং অত্যধিক স্নেহে লালিত পুত্র ক্রেগকে কেউ কেউ ব্যর্থপ্রতিভা বলতে চেয়েছেন--৩ কিন্তু আবার এও ঠিক যে, তাঁর থিয়েটার বিষয়ে লেখ ালেখি সারা পৃথিবীর নাট্যকর্মীদের কাছে প্রায় পাঠ্যবইয়ের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। ১৯১২ সালে মস্কোয় তিনি যে হ্যামলেট প্রযোজনা করেন, তার সফলতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও পিক্চার - ফ্রেম মঞ্চের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে তিনি মঞ্চচিত্রণকে এমন একসৃজনশীলতায় নিয়ে যান, যা আধুনিক থিয়েটার এখনও পর্যন্ত অতি অল্পই দেখেছে। ক্রেগ চাইতেন, থিয়েটার সম্পূর্ণত একজন মাত্র শিল্পীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রায় অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী সেই পরিচালকই নাটক লিখবেন, প্রযোজনা করবেন, মঞ্চচিত্রণ করবেন, পোশাক পরিকল্পনা করবেন। চূড়ান্ত বাস্তববাদী নাটক থেকে চূড়ান্ত কল্পনাশীল নাটক তিনি প্রযোজনা করবেন। এই পথ ধরেই বিশ শতকের থিয়েটারে নির্দেশক - প্রযোজকের সর্বাত্মক ভূমিকাপ্রতিষ্ঠিত হল। ক্রেগের সেই আদর্শ নির্দেশক হবার অধিকারী হয়ে এলেন ম্য াক্স্ রাইনহার্ট (১৮৭৩ - ১৯৪৩)। ঘুর্ণায়মান মঞ্চ, স্থায়ী মঞ্চস্থাপত্য, এক সঙ্গে একাধিক মঞ্চচিত্র সংস্থান, বহুমাত্রিক তল ও সিঁড়ির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রসিনিয়মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাইনহার্ট তাঁর প্রযোজনায় অর্কেস্ট্রা পিটও দখল করে নিয়েছেন--সার্কস, জনসভাকক্ষ, রাস্তায় নেমে থিয়েটার করেছেন, ফিরে এসেছেন গীর্জায়--সেখান থেকে আধুনিক য়ুরোপীয় থিয়েটার উদ্ভাবিত হতে পেরেছে। সোফোক্লেস থেকে গ্যায়েটে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ লিখিত নাটকগুলির অভিনয় করেছেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসিবাহিনীর দ াপটে সেই কাজ ঈষৎ দ্ধ হয়। জার্মানিতে সেই সময়েই তৈরি, হয়ে উঠতে থাকে একস্প্রেসনিজম্। রিচার্ড দ্য থার্ড নাটকে শুধুমাত্র একটি রক্তধারার উপরে জোর দেওয়া থেকে এই পদ্ধতি স্পষ্ট হয়েদেখা দেয়। আমেরিকার মঞ্চশিল্পী রবার্ট এডমণ্ড জোনস্ (১৮৯৩ - ১৯৫৮) ১৯২১-এ ম্যাকবেথ প্রযোজনায় কার্ডবোর্ড দিয়ে গড়ে তুললেন ওপরে উঠে যাওয়া খিলান, যার সঙ্গে নায়কের ভাগ্যদোষের একটা স ম্পর্ক পাওয়া সম্ভব। দান্তের ডিভাইন কমেডি-র জন্য স্বর্গ, নরক ইত্যাদি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে ম্যাডিসন স্কোয়ারে এক বিশাল মঞ্চও বানানো হয়েছিল --কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

লণ্ডনে তখনও বাস্তবাদের রাজত্ব চলছে। রাশিয়ার এমনি সময়ে এলেন মায়ারহোল্ড (১৮৭৮ - ১৯৪৩)। দৃশ্যপটের বাস্তবতাকে বিদায় করে তিনি শূন্যমঞ্চে অভিনেতার শরীরকেই প্রাধান্য দিতে চাইলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিকতা রাশিয়ায় প্র ায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত জায়গায় ধবংস আর বিনষ্টির পরনতুন করে কিছু সৃষ্টি করার জন্য সংগঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেতে লাগল --যাতে জীবনে পুনরায় স্থিতি ফিরিয়েআনা যায় এবং ভবিষ্যৎ গঠন করা যায়। আলেকজাণ্ডার তারোভ (১৮৮৫-১৯৫০) তাঁর

প্রযোজনায় নিয়ে এলেন নানান তল, কাঠের সিঁড়ি - যা উপরের দিকে অভিনেতাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, ব্যবহার করলেন মই, অথবা মঞ্চের উর্ধাংশে নিয়ে এলেন পাটের আবরণে ঢাকা পাটাতন। যেসব নাটকে কারখানা বা ওয়র্কশপ দেখানো দরকার, সেখানেএই ধরনের মঞ্চ খুবই গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। গাণিতিক বিমূর্ততামণ্ডিত এই মঞ্চ সরে এল সরল প্রতীকি ব্যঞ্জনা থেকে--কিছুদিনের মধ্যে এ-ও পরিত্যক্ত হল। এবং রাশিয়ান থিয়েটার বাস্তববাদমুক্ত রীতিতে গ্রীসীয় স্থাপত্য, বিশেষায়িত বাস্তব শৈলী এবং কিছুটা রোমান্টিক চিত্রণ প্রবণতাকে পুনরায় আশ্রয় করতে চেয়েছে আরও আধুনিককালে।

দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধের পর ব্রিটিশ থিয়েটারের গুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা হল পিটার ব্রুকের সালোমে নাটকের জন্য প্রখ্যাত শিল্পী সালভাদর দালি-র মঞ্চচিত্রণ ও পোশাক রচনা অথবা বরিস অ্যারনসনের (১৮৯৮ - ১৯৮০) মতো চিত্রকরের মঞ্চের কাজ। এর সঙ্গে আছে আরও বহুসংখ্যাক পেশাদার মঞ্চচিত্রীর কাজের নমুনা। মাঝখানে থিয়েটার- ইন - দ্য - রাউণ্ডে-র জনপ্রিয়তার দণ প্রসিনিয়ম মঞ্চ ঈষৎ কোণঠাসা হয়ে পড়লেও ইবসেন বা চেকভের প্রযোজনা সূত্রে আবার প্রসিনিয়ম মঞ্চের নাট্যকর্ম গুত্ব পাচ্ছে। এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে সাম্প্রতিককালের মঞ্চেশিল্পীরাও যে কোনো রীতিকে অবলম্বন করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

১

মঞ্চস্থাপত্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সূত্রে অতঃপর বিষয়টিকে আমরা মঞ্চচিত্রণ অভিধায় চিহিত করব, কেননা আমরা দেখেছি প্রাচীন গ্রীক বা রোমান থিয়েটার থেকে এই বিশেষ শিল্পকলা বিবর্তিত হতে হতে যেন প্রায় চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সম্মিলিত ধারায় বদল ঘটাতে ঘটাতে এগিয়েছে। তাছাড়া, কেন একে মঞ্চচিত্রণ বলাই উচিত হবে, এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ মঞ্চচিত্রী খালেদ চৌধুরী -র ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় কথাটিকে ঠিকমত বলতে গেলে বলা যায় মঞ্চচিত্রণ বা মঞ্চবিন্যাস, অর্থাৎ মঞ্চকে চিত্রায়িত করা, তার ফাঁকা জমিটাকে সাজানো৪। কলকাতার সুখ্যাত সায়ক নাট্যদল আয়োজিত বক্তৃতায় শ্রীচৌধুরী পূর্বোক্ত বিষয়টির ব্যবহারিক ও নান্দনিক তাৎপর্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষাটি যে থিয়েটার এখনও গ্রহণ করতে পারেনি, তার নমুনা সায়ক আয়োজিত বক্তৃতার শিরোনামেই আছে। আমরা শ্রী চৌধুরী নির্দেশিত পথে মঞ্চচিত্রণ শব্দটিই গ্রহণ করব।

একটি নাট্যকর্মে মঞ্চচিত্রণের গুত্ব কি, সে বিষয়ে খালেদ চৌধুরী বলেন-- নাটকের ঘটনা যেখানে ঘটছে তার একটা পরিবেশ দরকার হয়। পরিবেশটা নির্ধারণ করে নাটকটাই। কিন্তু যিনি এটা রচনা করবেন তাঁর যেমন চিত্রের ধারণা থাকতে হয়, তেমনি নাটকটির গতি ও ধারা, চরিত্রদের ইতিহাস ইত্যাদি ও জানতে হয়। অর্থাৎ তিনি কেবল তাঁর শিল্পবোধের প্রকাশ নিয়ে ভাবছেন না, তাঁকে মূলত নাটকের ধর্মটিকেই নিয়ে আসতে হচ্ছে তাঁর কাজের মধ্যে। এ কথা অন্য এক দিক থেকেও সত্যি, কেননা মঞ্চচিত্রণের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করার পর আজ এ কথা বলাই যায় যে, মঞ্চচিত্রণকলার সব রকমের সম্ভাবনাই একরকম আবিস্কৃত হয়ে গেছে --সর্বপ্রকারের শৈলীই ব্যবহৃত হয়ে গেছে। সুতরাং আজ তাই একজন শিল্পীকে শুধুমাত্র নিজেকে প্র্ন করে জানতে হয়, নাটকের ভাব ও বিষয়ের ব্যঞ্জনার সঙ্গে তাঁর কাজ কীভবে এবং কতটুকু সঙ্গতি রক্ষা করবে। গর্ডন ত্রেগ একদা বলেছিলেন-- /ঢ প্তন্দ্বব্ধ প্পম্ভ ব্দন্তন্দ্ধন্দ্বব্দ ন্ধজম্পভ্র প্সত্তব্ধ প্সন্দ্র ত্সব্ধ প্লন্দ্বব্জন্দ্বপ্তম্ভ ব্ধড়ন্দ্ব ন্মপ্তম্ভ, ত্বব্ধ ন্দ্রব্জপ্সপ্প ভ্জপ্সম্ভ ব্দভ্রন্দ্বন্দ্বন্মব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়প্সত্তন্ধড়ব্ধ ভ্রড়নন্তড় ব্ধড়ন্দ্ব ন্মপ্তম্ভ ড্রব্দ ন্তপ্সন্দত্তব্জন্দ্বস্তু ত্বন্মপ্স প্পন্দ্ব,* এ কথা আজকের মঞ্চচিত্রী কি ভাবতে পারনে ? এমন কি বরিস অ্যারনসন যেমন বলেন /ঢ ব্দব্ধব্জপ্সন্ধপ্তম্ভ ন্ত্বপ্তনন্দ্বন্দ্ব ব্ধড্রব্ধ ন্দ্রপ্সব্জ ন্দ্বন্তড় ন্মপ্তম্ভ ভ্সত্ত ন্দ্রনব্জব্দব্ধভ্রস্তু ন্দ্রপ্সব্জন্দ্বপ্পপ্সব্দব্ধ প্পত্তব্দব্ধ ন্তব্জন্দ্বব্ধন্দ্বত্র ব্দম্ভন্তন্দ্ব ভ্রড়নন্তড়, ন্ডড়ন্দ্বব্জন্দ্ধব্ধ ন্ড নব্ধব্দ স্তুন্দ্বব্দনন্ধ,ত্রপ্তব্জন্দ্বস্তুম্ভ ড়প্সপ্তস্তুব্দ ব্ধড়ন্দ্ব প্পম্ভব্দব্ধনশুত্বন্দ্ব প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্ধব্ধনব্জন্দ্ব ন্দ্বন্দ্ধব্ধস্থট্টভ্সন্দ্ব ভ্রড়প্স ব্দত্তন্তন্তন্দ্বব্দব্দন্দ্রত্তপ্তপ্তম্ভ স্তুন্দ্বব্দনন্ধব্দ ন্দ্রপ্সব্জ ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্বব্ধব্জন্দ্ব নব্দত্রপ্তব্দপ্সত্র ন্মন্দ্রব্ধন্দ্বব্জ, ব্দন্তত্তপ্তন্মব্ধপ্সব্জ,ত্রব্জন্তড়নব্ধন্দ্বন্তত্বব্ধ, প্সব্জ ন্দ্ধন্ধন্দ্বন্দ্বব্জ. ঢ ব্জ্রব্জন্দ্ব ন্ডব্দব্ধন্তন্দ্বব্দ, ড়ন্দ্ব নব্দত্রপ্তপ্ত প্সন্দ্র ব্ধড়প্সব্দন্দ্ব.* এতটা বোধহয় আজকের শিল্পী বলতে পারেন না। বরং আজকের শিল্পী এ বিষয়ে সচেতন এইভাবে প্রত্যেক মাধ্যম পরস্পরকে আত্মস্থ করে যে সমগ্রতার অনুভব নাট্যকর্মের মধ্যে নিয়ে আসে, সেটাই টোট্যাল থিয়েটার।...মঞ্চশিল্পীকে সেই সমগ্রতাকে বুঝতে হবে। তাই আমার ঝিাস, মঞ্চচিত্রণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প নয়, বরং একটি সাহায্যকারী শিল্পমাধ্যম।৫ টোট্যাল থিয়েটারের এই ধারণাটি অবশ্য বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ থেকেই আহরিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ সম্পর্কে সচেতনতা প্রাচীন ভারতেও ছিল। আচার্য ভারতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মঞ্চ, অভিনয়, মুদ্রা ও ভঙ্গি , হাঁটাচলা, কাহিনী ও দর্শক--এই সবকিছু মিলে যে শিল্পের জন্ম হচ্ছে, তা কি ! সেখানে স্বীকৃত হয়েছিল, সমস্ত শিল্পের থেকে নাট্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও পরিমিত উপাদান নিয়ে দর্শকদের উপর সৃষ্টি করা হয় এক শিল্প অভিঘাত। এই আলোচনায় পৌঁছবার মাঝখানে আচার্যদের জানিয়েছিলেন, নাটকের বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী মঞ্চের বিভিন্ন মাত্রা ও তলের কথা ভাবতে হবে। বলা বাহুল্য, এ মঞ্চচিত্রণ বা মঞ্চস্থাপত্যজনিত কথা নয়, এ হল বিভিন্ন মঞ্চগৃহ ও মঞ্চবেদির কথা।৬ তিনি কোনো দৃশ্যপট রচনার কথা বলেন নি, বরং হাত ও অন্যান্য অঙ্গের নানামুদ্রায় দৃশ্যপটের অস্তিত্বকে কল্পনায় জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন। যেমন দুহাত প্রসারিত করে এবং উপরে তুলে উঁচু পর্বত বা গাছ বোঝানো হবে, সমুদ্র বা হ্রদ বোঝাতে পতাকা ভঙিতে হাতের মুদ্রার ব্যবহার করতে হবে। পণ্ডিতদের অনুমান, যবনিকা না থাকার দণ এবং দৃশ্য-অঙ্ক পরিবর্তনের কোনো বাহ্যিক ব্যবস্থা না থাকার দণ নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যপটের কথা বলা হয়নি।৭

তাহলে সহজেই বলা যায়, কেবল প্রসিনিয়ম মঞ্চই নয়, মঞ্চচিত্রণের ধারণাও আমরা পশ্চিম থেকে নিয়েছি। মধ্যযুগে চন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বৌষ্ণবীয় বিষয় নিয়ে প্রাতিবেশিক নাট্য লীলাকে যদি মনে রাখি, তাহলে তাকে কেউ কেউ যাত্রা বা থিয়েটার - ইন - দ্য - রাউণ্ড অথবা প্রাতিবেবশিক থিয়েটার (environmental theatre) -এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে হবে, সেই থিয়েটার আদৌ কোনোনির্মাণশিল্প নয়, মূলত চরিত্রানুযায়ী পোশাক এবং রূপারোপ করে চলচিচত্রের মতো পরিবেশের সাহায্য নেওয়া। আবার চৈতন্য প্রভাবেই যে যাত্রারীতির উদ্ভব হল, সেখানেও দৃশ্যপট জায়গা পেল না। এই সব কারণে, গত শতাব্দীরশুতেই রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের মঞ্চরীতি ও নাট্যপ্রবর্তনা সন্ধানের দিকে যেতে চাইলেন, তখন ১৯০২ সালে লিখিত রঙ্গমঞ্চ নিবন্ধের গোড়াতেই লিখলেন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।৮

সকলেই জানেন, নাটকের ভাব, বস্তু, রচনারীতি এবং উপস্থাপনার নিজস্বতায় বাংলার নাট্যকলায় ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এককভাবে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনিও নাট্যকলাকে পেয়েছিলেন এক ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে। যে পরম্পরা থেকে বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত, তারই সুবাদে। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ (১৭৪৯- ১৮১৭) ডোমতলায় জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়িতে যে মঞ্চটি তৈরি করেন, অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, সেটি ছিল পিকচার - ফ্রেম স্টেজ -এরই অনুকৃতি। উপরন্তু তাঁর থিয়েটারের দৃশ্যপট আঁকিয়ে জোসেফ ব্যাটল্ এসেছিলেন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বঙ্গালয় থেকে। তবু লিয়েবেদেফের বিজ্ঞাপন থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই তিনি প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চকে একই বাঙালি রীতির সজ্জায় সজ্জিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।৯

নব্য - ঔপনিবেশিক সমাজ, সংস্কারপ্রিয় নবজাগ্রত সমাজ ইংরেজি চি ও সভ্যতার সংস্পর্শে পরিবর্তন চাইছিল উনিশ শতকের গোড়ায়। তারই এক ফলিত রূপ হয়ে দাঁড়াল থিয়েটার। ১৮২৬ -এর সমাচারচন্দ্রিকা-য় বাঙালিদের জন্য ইংরেজি ধরনের একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে।১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১ - ৬৮) হিন্দু থিয়েটারের ছাত্ররা যে জুলিয়াস সীজারের অংশ ও উত্তররামচরিতে-র ইংরেজি অনুবাদ অভিনয় করতে এগিয়ে এলেন, তাদের জন্য ইংরেজ নাট্যশিক্ষক আসছেন। এমনকি, শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু, যিনি বিদেশ থেকে নানা যন্ত্রপাতি কিনে এনে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জন্য ভিন্ন মঞ্চতল তৈরি করে অবশেষে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিয় করেন - তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ২২শে অক্টোবর ১৮৩৫ -এর হিন্দু পাইওনিয়র মন্তব্য করছে-- এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে।১১ এখানে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের জন্য যে দৃশ্যপটগুলি আঁকা হয়. তাদের পারস্পেক্‌টিভে ভুল আছে বলেও হিন্দু পাইওনিয়র মন্তব্য করেছিল।

এই বিলিতি পদ্ধতির সঙ্গে ত্রমশ যুত্ত হল জাঁকজমক। সাতুবাবুর বাড়িতে অভিজ্ঞান শকুন্তলা-র শরৎচন্দ্র ঘোষ রাণীর বেশে বহুমূল্য বিশ হাজার টাকার গয়না পরে মঞ্চে এলেন, দর্শকদের তাক লেগে গেল। নতুন শতাব্দীরগোড়ায় ভারত সংগীত সমাজে-র সৌখিন অভিনয় মেঘনাদবধ কাব্যে ও বহুমূল্য জড়োয়া সেট পরে মঞ্চে এসেছেনঅভিনেতৃবর্গ। স্বাভাবিকবাদের এই স্থূল নান্দনিকতাই প্রাধান্য পেল থিয়েটারে। ১৮৫৭ -র ৫ জানুয়ারি ঠাকুরবাড়িতে নবনাটক -এর অভিনয়ে বনদৃশ্যের সীনে নানাবিধ তলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়ে জুড়িয়ে, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকারের বনের মতই বোধ হইত।১২

২

মঞ্চের ইতিহাসে দেখা যা, সেখানে রোমান্টিসিজম্ এসেছিল দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিশে গিয়ে। একথা বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রের অতিমাত্রায় সত্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯ - ১৯২৫) তো বলেইছিলেন, হিন্দু মেলার পর থেকে তাঁর সব কাজেই দেশবাসীর মনে স্বদেশচেতনা জাগাবার ব্যাকুলতা দেখা দেয়। বাল্মীকি প্রতিভা কালমৃগয়া ইত্যাদি গীতিনাট্যের মঞ্চের চিত্রণে স্বভাববাস্তবতার স্থুল স্তূপীকরণে তাঁর প্রবনতাও সেই রোমান্টিকতারই একটি অভিব্যত্তি নিশ্চয়। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল সমকালীন পেশাদার মঞ্চেও, শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটারে মাটির মঞ্চ বানিয়ে তাতে ঘোড়া নামাচ্ছিলেন। এই রোমান্টিক রিয়্যালিজমে-র চমৎকার পরিচয় তুলে ধরে ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ -এ চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটারে (জন্মকালেই যার মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল জাতীয় আবেগ)-র নীলদর্পণ অভিনয়ের মঞ্চবিবরণী--দুই পার্শ্ব ও ফুটপাতে গ্যাসের আলো ছিল। তাহাই কেবল দর্শকমণ্ডলীর আলোকের ভরসা মাত্র। রঙ্গগৃহের উপরিভাগে একটি আলোকময় Crown অথাৎ রাজমুকুট শোভা পাইয়াছিল।১৩ মজার কথা এই, অভিনয় চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহের বাতি নিভিয়ে দেওয়ায় এডুকেশন গেজেট -এর (১৩ ডিসেম্বর ১৮৭২) দর্শক - সমালোচক ত্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এও উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রসিদ্ধ দৃশ্যপট - রয়য়িতা ধর্মদাস সুর (১৮৫২ - ১৯১০) তাঁর আত্মজীবনী - তে দৃশ্যপট আঁকবার যে মনোরম মানবিক বিবরণী দিয়েছেন, তা বস্তুত নেপথ্য কাহিনী যা কখনোই দর্শকের কাছে পৌঁছয় না। দর্শক কিন্তু সেই দৃশ্যপট দেখে খুশি হয় নি, মনে করেছে অধিকাংশ দৃশ্যগুলি ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত হয় নাই। কারণ জাতীয় চিত্রে আদর্শ সকল স্থাপন করাই কর্তব্য। অর্থাৎ, আবার সেই রোমান্টিক রিয়্যালিজমের দাবি। তবে, সমালোচকের শিল্পদৃষ্টির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। আধুনিক মঞ্চের দুপাশে যে Wing বা flat ব্যবহৃত হয়, যার পারিভাষিক নাম 'ব্বপ্সক্সপ্পন্দব্বপ্সক্স', খুব সম্ভব তার ব্যবহার ন্য

াশনাল থিয়েটারের শিল্পীদের জানা ছিল না, এ কথা বোঝা যায় উক্ত সমালোচনা পড়েইঅনেক গৃহের পার্শ্ববর্তী দৃশ্য (Wing) না থাক াতে গৃহের সৌন্দর্য হ্রাস পাইয়াছিল।

ঠিক ঠিক তারিখ অনুযায়ী না বলা গেলেও একটা লক্ষ করা যায় উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুতে বাংলায় দ্বি-মাত্রিক পশ্চ াদ্‌পটের সঙ্গে সমতা রেখে ত্রিমাত্রিক মঞ্চোপাদান ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ - ১৯৪১) এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬ - ১৯১৬)। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের যেসব ছবি অ ামরা দেখেছি, তাতে পশ্চাতে দু-ভাগে দুটিঝোলানো সীন, সামনে এরিকা গাছের পল্লব, মঞ্চের পাটাতনের দামী কার্পেট - তাতে ব াঘমুণ্ডসহ বাঘছাল পাতা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, মঞ্চে বেশ ভারি কালীপ্রতিমা ছিল।১৪ অন্যদিকে, ১৮৯৯ -এর ১৬ই সেপ্টেম্বর এম ারেল্ড মঞ্চেক্ল্যাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ নামাচ্ছেন বঙ্কিম - উপন্যাসের নাট্যরূপ ভ্রমর। ছবি দেখলে বোঝা যায়, পিছনে বাণী পুষ্করিণীর দ্বিমাত্রিক পটের সামনে পুষ্করিণীর ত্রি-মাত্রিক ঘাট ও চাতালের মাঝখানে থাকত ফাঁদ দরজা (trap door)। চড়্‌চড়্‌ করে পরনের শার্ট ছিঁড়ে গোবিন্দলাল রূপী অমরেন্দ্রনাথ এক উত্তুঙ্গ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে ঝাঁপ দিতেন জলে, অর্থাৎ নেমে যেতেন দরজা দিয়ে। অতি দ্রুত মঞ্চের তলায় অদৃশ্য গোবিন্দলালা ও রোহিনীর বস্ত্র দুপাশ থেকে জল দিয়ে সিক্ত করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ সুকৌশলে সম্পন্ন হত। তার ফলে যথার্থ বাস্তবের মঞ্চমায়ার সৃষ্টি হত।১৫ এই বিবরণী থেকে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের রঙ্গ মঞ্চ নিবন্ধের একটি উক্তি ছবিটা কেন ? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিয়া থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না, তাহা অঁ াকামাত্র আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুষতা প্রকাশ পায়। তাঁর কথার যুক্তি আমরা বাণী পুষ্করিনীতেই পেয়ে যাই-- অমরেন্দ্রনাথ এতসব কাণ্ড করেন, কিন্তু ছবিতে আঁকা পুষ্করিণীর জল কি নড়ে ওঠে ? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের কলম নীরব। তাহলে তো রবীন্দ্র ভাষাতেই প্রশ্ন করা যায়, চিত্রকারের কাছে থেকে ভিক্ষে করে আনা ছবির সাহায্যে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করে নিজের ক াজকে সহজ করে তোলাই কি নাট্যকলা ?

কেবল ত্রি-মাত্রি মঞ্চ নয়, অমরেন্দ্রনাথই প্রথম মঞ্চে বাস্তবানুকারী আসবাবপত্র ব্যবহার করেছিলেন। তীব্রএক সংরাগ থেকে থিয়েটারের জন্য অনেক কিছুই করেছিলেন তিনি। আবার তিনিই থিয়েটারে গিমিকের প্রবক্তা। অপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল থেকে শু করে আকাশে ওড়া, শূন্যপথে দেবতার আবির্ভাব, নদীবক্ষে যুদ্ধ, ফোয়ারা, আগুন, নানা জীবজন্তু দেখানো - ইত্যাদির প্রবর্তন তাঁরই কীর্তি। তিনিই প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখানো শু করেন--সম্ভবত থিয়েটারেও ফিল্ম প্রোজেকশানের সাহায্য নেন। বলা বাহুল্য, এ কেবলই দর্শককে বাস্তবতার বিভ্রম দেখিয়ে চমৎকৃত করে দেবার আকাঙ্ক্ষা, এরউইন পিস্‌কাটর (১৮৯৩ ১৯৬৬) অথবা বার্টোল্ট ব্রেশ্‌টের (১৮৯৮ - ১৯৫৬) বাস্তবতার মায়া পরিহার করে নাট্য- অভিঘাতকে আধুনিক অর্থে বিস্তৃত করবার জন্য নয়। বাংলা মঞ্চের এই গিমিক প্রবণতা শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১৮৮৯ - ১৯৫৯) ও তৎ - পরবর্তী নবনাট্য আন্দোলনের বিস্তার সত্ত্বেও পার্সি থিয়েটার হয়ে গত শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে মিনার্ভায় উৎপল দত্তের অঙ্গার কল্লোল বা ঝিরূপায় সেতু ইত্যাদি সকল নাটক অতিক্রম করে কিছুদিন আগে পর্যন্ত থিয়েটারের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বিবেচনা করেছেন প্রযোজক দল, মায় দর্শকরাও।১৬

৩

শিশিরকুমার এবং রবীন্দ্রনাথ - বাংলা থিয়েটারের এই দুই শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন মার্গে মঞ্চচিত্রণে নিয়ে এসেছিলেন নান্দনিক শিল্পগুণ। ১৯২৩ -এ ইডেন গার্ডেনে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটক অভিনয়ের পর ১৯২৪ -এর ৬ই আগষ্ট মনোমোহন মঞ্চে শিশিরকুমার যে াগেশচন্দ্র চৌধুরীর লেখা সীতা নাটক অভিনয় করলেন, সেখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য চা রায় (১৮৯০ - ১৯৭০) অজন্তা গুহাচিত্রের স্থ াপত্য ও ভাস্কর্যের আদলে তৈরি করলেন রামচন্দ্রের প্রাসাদ - স্তম্ভ, খিলান ও নানা তল। সমগ্র প্রযোজনায় সেই মঞ্চব্যবস্থার ব্যবহার করা হয়েছিল অত্যন্ত শিল্পসম্মত উপায়ে। ওই একই বছরের আগষ্ট - সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বাষট্টি বছব বয়সে অবতীর্ণ হলেন জয়সিংহেরভূমিকায়। সেই অভিনয়ের মঞ্চে গগনেন্দ্রনাথের কিউবিক চিত্রধর্মের আদলে চৌকো প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে নির্ম াণ করাহয়েছিল মন্দিরের বেদি--দুপাশে বেদির মাঝখানে সিঁড়ি । বেদির গায়ে কাগজে রঙের সাহায্যে আনা হয়েছিল পাথুরে ভাব। বেদির উপরে দীপাধার, পূজার ফুল, তৈজস। অত্যন্ত আধুনিক এবং পরিমিত এই আয়োজন আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বহুরূপীর রক্তকরবী নাটকে খালেদ চৌধুরী - কৃত মঞ্চের কথা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের নাট্যচর্চায় স্বভাববাদের স্থুল অনুকৃতি ছাড়িয়ে পূর্বোক্ত রঙ্গমঞ্চ নিবন্ধের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ এক অন্যতর মঞ্চচিত্রণ মধ্য দিয়ে এখানে এসেছিলেন । অথচ সেই বিবর্তনের পথটি একরৈখিক ছিল না। শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত লেখা নাটকগুলি শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিমণ্ডলে যখন অভিনীত হয়েছে, তখন ছাত্ররা মাটির টিবি, গাছের ডাল, দোলনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এক ধরনের প্রকৃতিঘেরা প্রায় - স্বভাববাদ ঘেঁষ া নান্দনিকতা গড়ে তুলেছে। তাতে যে রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল, সে কথা বোঝা যায় এই নাটকগুলি , বিশেষত ফাগুনী যখন জোড়াসাঁকে া,য় বিচিত্রাভবনে অভিনীত হয়েছে, কিংবা আলফ্রেড থিয়েটারে হয়েছে শারদোৎসব --তখন মঞ্চ পরিবেশকে যথাসম্ভব ন াটকের অনুকূল করে তুলতে সবিশেষ মনোযোগী হচ্ছেন তিনি। কিন্তু বিচিত্রা-য় ১৯১৭ র ডাকঘর অভিনয়ের জন্য যে খাঁটি ভারতীয়

আলঙ্কারিক মঞ্চ রচিত হল, ত বড়ই বিস্তারিত (elaborate)। শিল্পসুলভ প্রতীকধর্মও সেখানে প্রযুক্ত হয়েছে-- যেমন অমলের ঘরের পিছনে ঘন নীল রঙে বনাত্ টাঙিয়ে আকাশ বোঝাতে তার গায়ে রূপালি কাগজ কেটে অর্ধচন্দ্র সেঁটে দেওয়া, অথবা ঘরের মধ্যে উড়ে যাওয়া পাখির শূন্য খাঁচা। অথচ ডাকঘর সচরাচর একটি সাংকেতিক ব্যঞ্জনাবাহী নাটক হিসেবে বিবেচিত। লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে ১৯৩০ সালে এ নাটকেরঅভিনয়ে, কিংবা ১৯১০ -এ অ্যাবি থিয়েটারে অভিনয়ে ঘরের বাইরের রঙকে সাদা রেখে, ভিতরের দেয়ালকে টকটকেলাল রঙ দেওয়া হয়েছিল। তারও পিছনে ছিল ঘন কালো উজ্জ্বল পশ্চাদ্পট, তার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান ছিলআংশিক সবুজ বর্ণালী। রঙ ও আকারের এই সাংগীতিক সুষমা সাংকেতিকতার বড় গুণ-- গর্ডন ত্রেগের সাংকেতিকতার ধর্ম মেনেই ডাকঘর এর এই মঞ্চ রচিত হয়েছিল। অ্যারি থিয়েটারের অভিনয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেখেছিলেন। ১৯১৭ -য় তাঁর নিজের প্রযোজনায় পশ্চিমী সংকেতধর্ম বর্জিত হয়েছিল কেন, তার কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত আলংকারিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন, কেন গোটা মঞ্চকে অমলের ঘর ধরে নিয়ে খড়েরচাল ইত্যাদির সাহায্যে স্বভাববাদী চেহারা দিলেন, তার কারণ অনুমান করা শক্ত।

হয়তো এমন হতে পারে, মঞ্চের রূপচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ খুঁজতে চাইছিলেন ভারতীয় এক চিত্রণধর্ম (Pictorial Beauty)। তাই রচনা ও অভিনয়ের চোদ্দ বছর পরে, ১৯২২ -এর ২০শে সেপ্টেম্বর শারদোৎসব নাটকের অভিনয়ে মঞ্চরীতি সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। তাঁর আশ্রমের শিল্প শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে নীল পশ্চাদ্পট (শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন, একটিই ঘন নীল কাপড় দীর্ঘদিন আশ্রমের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত হয়েছে), কাঠের ফ্রেমে আঁটা চওড়া কাপড়ের লাল গেয়া ঘন হলতে রঙের Wing --তার ওপরে একই রঙের fly ---রঙিন কাথিয়াওয়াড়ি কাজ বা নানা প্রদেশের খাঁটি দেশীয় শিল্পজাত রঙিন নক্শা কাটা কাপড়ে ঢাকা আসবাব, প্রদীপদানি, ফুলের ঝারি ইত্যাদির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিল্পচিকর সমাবেশ রঙের সুষমাকে সাংকেতিকতায় নয়, নান্দনিকতায় মুক্তি দেয়। এই নন্দনধর্ম আবও পরিশীলিত রূপ নেয় ১৯২৭ -এ নটীর পূজা-র অভিনয়ে। এইখান থেকে শু হয় রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাট্যানুগ মঞ্চবিন্যাস, কথকতার আঙ্গিকে নৃত্যনাট্যের উপস্থাপনা।১৭

বাংলা থিয়েটারের মঞ্চচিত্রণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর তিনের দশকে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ ছিল সতুসেন (১৯০২ - ১৯৭১)-এর আগমন। তাঁর আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকে জানা যায়, ফ্রান্সের ল্যাবরেটরি থিয়েটারে তিনি স্তান্লিাভ্স্কির শিষ্য রিচার্ড বলিস্লাভস্কির কাছে শিক্ষানবিশি করেছিলেন, ত্রমে সেখানকার টেকনিক্যাল ডিরেকটর হয়েছিলেন এবং চেকভের বেশ কিছু নাটক, মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড শেকসপিয়ারের মিড সামার নাইটস্ ড্রিম ইত্যাদি নাটকে প্রয়োগপ্রধানের কর্তব্য পালন করেছিলেন। আমেরিকার থিয়েটার গিল্ডের কাজ দেখেছিলেন তিনি, বার্লিনে নিগয়ে রাইনহার্টের দ্য মিরাক্ল দেখেছিলেন, এমন কি গর্ডন ত্রেগেরও সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। একজন বাঙালি হিসেবে আন্তর্জাতিক থিয়েটারের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নির্দেশক শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১৮৮৯ - ১৯৫৯) - কে বিদেশের দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করাবে। এমন কি, তিনি এও চেয়েছিলেন, যে সম্ভাব্য ছটি নাটক নিয়ে শিশিরকুমারের দল আমেরিকা যাবেন, তার মধ্যে অন্তত দুটি যেন ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়, কারণ তিনি চাইছিলেন হলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতারা শিশিরকুমারের কাজে আগ্রহী হয়ে অন্তত একটি নাটককে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। আমি যদিও জানতাম যে প্রত্যেকটি ইংরিজিনবিশ অভিনেতা - অভিনেত্রী চেয়ে আমি শিশিরকুমারের কাছে অসম্ভব দাবি করছি, তবুও কেন যেন আমার মনে হত তিনি সমস্ত অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারঙ্গম।১৮

শিশির কুমারের আমেরিকা ভ্রমণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। কিন্তু এহেন সতু সেন ১৯৩১-এ দেশে ফিরে শিশিরকুমারের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে কাজ করবার পর নাট্যনিকেতনের পরিচালক ও শিল্প নির্দেশক হন। নিউইয়র্কে তিনি মঞ্চের যেসব কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, তার কিছু কিছু তিনি এ নাটকে দেখান, যেমন মঞ্চে ঝড় - জল - বিদ্যুৎ ইত্যাদি। তাঁর খোলা মঞ্চকা মঞ্চে আলোকসম্পাতের ইতিহাস এবং বিশেষত আলোর রঙ বিষয়ক নানা দৃষ্টিকোণ নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলি নাট্যশিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।১৯ তা বাদে, নাট্যবিষয়ের বিধিবদ্ধ সময় নির্দিষ্ট করা, ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার, বিশেষত পরবর্তী নাট্যচর্চায় আলোর বৈজ্ঞানিক শিল্পগতও মনস্তাত্বিক গুত্ব প্রতিপাদনে তাঁর ভূমিকা খুবই স্মরণীয় --তবু ও বলা যায়, তিনি যেন প্রায় শিশিরকুমারেরমতো থিয়েটারের কৃৎকৌশলকেই উন্নত করে গেলেন--নূতন যুগের উপযোগী নাটকের আগমন সূচিত হল না তাঁরও হাতে টোট্যাল থিয়েটার-ই বলি, আর নবনাট্যই বলি, তার সম্ভাবনা দেখা গেল না তাঁদের কারোর কাজে -- যার জন্য আমাদের থিয়েটারকে অপেক্ষা করতে হল আরও কিছুদিন। একথা আজ আর নতুন করে বলবার দরকার নেই, পূর্ববর্তী বিভাগে যাঁদের নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত আমরা উল্লেখ করেছি-- তাঁদের প্রভাব তথাকথিত গণচেতনার নবান্ন-র মঞ্চ প্রয়োগে আদৌ সম্ভব ছিল না। যদি বলি শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়কলার বৈশিষ্ট্যে, নাট্য সম্পাদনা ও অভিনয় নির্দেশনার বৈশিষ্ট্যে শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭)- কে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, তাহলে নাট্য - অন্তর্গত নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ শ্রী মিত্র অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে, তাঁর শিল্পকর্মের সম্পদ অন্তর থেকে উপলব্ধি করবার পর। তার সঙ্গে নিশ্চয় সতু সেনকেও যুক্ত কারা চলে। নমুনা হিসেবে শুধু নবান্ন নাটকে শ্রীরঙ্গমের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহারের কথা বলা যথেষ্ট নয়, বরং বলা চলে মঞ্চ ও আলোর যুগলবন্দী নাট্যের যে মনস্তাত্ত্বিক শিল্পগুণকে তুলতে ধরতে শিখল জবানবন্দী বা নবান্নের মঞ্চরূপে, তার পূর্বসুরিতা করেছেন এঁরাই - পরোক্ষে, কিন্তু গভীরভাবে।

জবানবন্দী দুটি দৃশ্যের নাটক। প্রথমটি গ্রামের, অস্পষ্ট ভোরের আলোয় শু হচ্ছে। আলো - কে যথাসম্ভব দৃশ্যানুগ রেখেছিলেন নির্দেশক। দৃশ্য শেষ হয় পরাণ মণ্ডলের ভিটে ছেড়ে যাবার মর্মান্তিক বেদনায়। দর্শক দেখলেন, পরাণ একমুঠো মাটি তুলে নিচ্ছে হাতে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। আঙুলের ফাঁক গলে মাটি ঝরে পড়ছে। আব্ছা আলোয় অনেকক্ষণ দৃশ্যটিকে স্থায়ী করেই প্রখর আলো জ্বলে উঠল, পিছনে শহরের দৃশ্যের ময়লা বিশ্রি ফ্ল্যাট উল্টো করে রাখা - একেবারে নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি। এই মঞ্চায়ন দেখে দর্শকের মনে হয়েছিল বাংলা নাট্যকলা বাঙালির জীবনের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে।

জবানবন্দীতে সূচনা, নবান্ন -য় পরিণতি। ইতমধ্যে বহু আলোচিত নবান্নের মঞ্চবৈশিষ্ট্য। প্রথম দৃশ্যে নেপথ্যঘোষণার পর মঞ্চ জুড়ে ম ানুষের ছুটোছুটি, পড়ে যাওয়া, নানান চিৎকার ও ধ্বনি, আগুনের লেলিহান শিখার নাচন - আবার তৃতীয় দৃশ্যে কেবল পিয়ানোয় বন্যার এফেক্ট্ - এই নাট্যের শিল্পসমগ্রতার সাক্ষর। পিছনে যে ঘরের চালা করা হত, ঝড় শেষে হেলে পড়ত তার চাল, তার পিছনে ম ালভূমির মতো উঁচু প্ল্যাটফর্ম একটা শ্রীহীন ধ্বংসের চেহারা নিয়ে ফুটে উঠত।

নবান্ন -এ চটের পর্দার ব্যবহার এখন কিংবদন্তী। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরামর্শে এই চটের ব্যবহারকরতে গিয়ে শম্ভু মিত্র চমৎকৃত বোধ করেছিলেন নূতন এক শিল্পিত গভীরতা প্রকাশের রূপ দেখে। মুখে কালি লাগা ছেঁড়া কাপড় পরা মানুষগুলির বিভিন্ন বিন্যাসের পিছনে ঝকঝকে নতুন চটের পর্দা, ওপরের বর্ডারগুলো তুলে দেওয়ায় সেই চটের পর্দা নিয়ে আসত এক বিশালতার ব্যঞ্জনা। ঘূর্ণায়ম ান মঞ্চের উপরে পৃথক তিন ভাগে সাজানো স্টেজের দৃশ্যপট, তলতা বাঁশের খুঁটি দিয়ে তিনটে বাহু তৈরি করে চাকতির কেন্দ্র থেকে কিনার পর্যন্ত পর্দাগুলি সেই বাহু তিনটিতে লাগানো। যে দর্শক তখন পেশাদার মঞ্চে মধ্যবিত্তের ঘরে তিনটে flat দিয়ে তৈরি দেয়াল (কখনো কখনো ছাতও দেখেছে, তার থেকে ঝুলছে আলো) দেখেছে, তার চোখে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যেতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের শব্দকে ঢাকতে ব্যবহারিক কারণেই দরকার ছিল ধ্বনি বা সংগীতের। ক্লিশে আবহ বাজাবার বদলে মানুষের জীবন্ত আবেগকে নেপথ্য থেকে সমবেত আর্তনাদে ভাত বা ফ্যানের প্রার্থনায় তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলে যান্ত্রিক শব্দ চাপা দেওয়ায় তা শিল্পের ব্যবহারিক স্তর অতিক্রম করে। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে একটিমাত্র হাসপাতাল দৃশ্যে সজ্জার অনর্থক বাহুল্য বর্জন করে চটের গায়ে ল াল ত্রস আর লাল শালুতে সাদা দিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় লিখে কিংবা দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে একটা রেলিং আর একটা বেঞ্চিদিয়ে পার্ক সাজানো, নাটকের শেষে মুরগি লড়াই বাদ দিয়ে লাঠি খেলা এবং বইতে বাদ যাওয়া একটি গান জননী গো জন্মভূমি বন্দি গো র াণী গাইতে গাইতে মঞ্চের সামনে দিয়ে সিলুয়েটে মাথায় প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় মেয়েদের চলে যাওয়া যেন সমগ্র নাটকটিকে এক বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসে। শেষ দৃশ্যে পিছনের পর্দায় আলো আসতউইংসের ধার থেকে। চরিত্রের উপর আলো না ফেলে পর্দায় অ ালোর ব্যবহার করে নাট্য অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেনশিশিরকুমার দিগ্বিজয়ী নাটকে, তারই অন্যতর এক শিল্পিত রূপ প্রকাশ পেল নবান্ন নাটকের প্রথম ও শেষ দৃশ্যে, ভিন্নতর নাট্য ব্যঞ্জনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্যের এই নাটকের মঞ্চায়নে খুঁজে পেয়েছিলেন এক দেশজ সরলতা - যা শম্ভু মিত্রকে প্রায় সারাজীবন প্রাণিত করে রেখেছিল।

নবান্ন নাটকের সাফল্য কতটা তার রচনাগুণে, কতটা সমকালীনতায়, আর কতটাই বা তার মঞ্চসফলতারকারণে -- এ নিয়ে তৎকালে যত বিতর্কই থাক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই করা চলে না বাংলা থিয়েটারের শিল্পগত সমগ্রতার একটি ধারণা এই প্রযোজনাতেই স্পষ্ট চেহারা নেয়। গণনাট্য ছেড়ে দেবার পর বহুরূপী প্রতিষ্ঠা করে শম্ভুমিত্র যে পেশাদারভাবে এই নাটকেরই পুনর্মঞ্চায়ন করেছিলেন, তার একটি বড়ো কারণ নিশ্চয় এই সামাজিকীকৃত শিল্পরূপ, যা শম্ভু মিত্রের নাট্যপ্রকল্পনার অন্তর্গত ছিল। অন্যত্র আমরা শ্রী শম্ভু মিত্রের সার াজীবনের নাট্যকর্মে তাঁর এই অন্বেষণকে বোঝবার চেষ্টা করেছি, শ্রীকুমার রায়ও তাঁর গ্রন্থে ও নিবন্ধে শম্ভু মিত্রের নাট্যসৃজনের নির্ম াণশিল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।২০ এখানে, একজন নির্দেশক হিসাবে তিনি খালেদ চৌধুরীর মতো একজন ছবি ওগানের জগতের মানুষকে কিভাবে মঞ্চচিত্রণের কাজে উদ্বেজিত করলেন, সে ইতিহাসই গুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ সাল থেকেএই মানুষটি মঞ্চচিত্রণের ক াজে সংলগ্ন হয়ে আছেন এখনও, এই আশি - উত্তীর্ণ বয়সে পৌঁছেও সদ্য প্রযোজিত উষাগাঙ্গুলি এবং রঙ্গকর্মীর অন্তরযাত্রা (২০০২) নাটকের জন্য মঞ্চচিত্রণের ক্ষেত্রে বদল আনছেন। সুতরাং তাঁর কাজের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সহজ নয়, সম্ভবও নয় তা আমাদের পক্ষে। আমরা কেবল বেছে নেব তাঁর গুত্বপূর্ণ দু-একটি কাজ।

রক্তকরবী নাটকে কোনো দৃশ্যভাগ ছিল না - অথচ তারই মধ্যে আছে সর্দারপাড়া, রাজার ঘর, মকরমুখ। শম্ভু মিত্র আমাকে নিয়ে বসলেন। আমরা সিগারেটের প্যাকেট, কিছু কার্ড কেটে কেটে এক - একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে লাগলাম। উনি বললেন, মনে করো এই হল রাজার ঘর। আর ওইখানে মকরমুখ। আমি সেগুলো বানাতে লাগলাম, একটা সিঁড়ি বানালাম, চত্বর বানালাম, সর্দার পাড়ার দিকে দুটো কলাগাছ বসালাম --মজুররা থাকে বলে। বস্তির একটা কোণ দেখা যাচ্ছে। পরে সব বাদ চলে যায়। ...বাড়তি ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যা যা ছিল, সেগুলোকে সাজিয়ে দিলাম।... নাটকের ভিতরে ভিতরে যা যা সূত্র পেয়েছি, সেইগুলো নিয়ে এলাম রাজার ঘরের ছবিতে।... উপরে আছে উড়ন্ত বাজপাখির ছবি। আর একটা

মূর্তি তৈরি করেছিলাম, যেন সে সমগ্র সভ্যতাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে অ্যাটলাসের মতো। তার উপরে আছে ধবজ খুব উপরে দিলে রাজা ভাঙতে পারবে না, তাই সেটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। অথচ এটা স্থাপত্যশিল্পের ব্যাকরণে অশুদ্ধ।

সেইজন্যই একটা লাল টকটকে দরজা ছিল তার পাশে। দেখলে মনে হবে, যেন সেই দরজা খুলে কেউ বেরিয়ে আসবে, কিন্তু কেউ বেরোয় না। অথচ ওটা ভীষণভাবে চোখ টানে। যতই এ কাজগুলো করছি, ততই যেন শিল্পের ছন্দজ্ঞান আমার মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, রাজার ঘরের চেহারাটা কুঁড়েঘরের মতো।... বাংলার এই চেনা চেহারাটা আমি চাইলামএইজন্য যে রাজার বাইরেটা খুব কঠিন এবং দুর্গম মনে হলেও তার অন্তর কোমল। তারই মধ্যে আছে দুর্ভেদ্যতা, তাই জাল আছে। আর তার নীচেটা শান বাঁধানো, বেশ একটা আধুনিক চেহারা এবং সেটা ঘুরে গেছে ভেতরের দিকে। এই ছন্দ বা সামঞ্জস্য এবং এই বিশ্লেষণ করে, ভাঙচুর করে সর্দারদের এলাকা রচনা করেছি। সমস্তটার মধ্যে রয়েছে এই শান বাঁধানো কাঠিন্য -- এবং কোনো সরলরেখা নেই।... চত্বরের এই ভাবনা এবং সর্দার পাড়ার কয়েকটা ধাপের ভাবনাটা গগনেন্দ্রনাথের স্কেচ থেকে নিয়েছি। তার সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাচ্ছে আরও কিছু উপাদান, ছবিটা চলে যাচ্ছে বিমূর্ততার দিকে।২১

শ্রীখালেদ চৌধুরীরই সাক্ষাৎকারভিত্তিক নিবন্ধ থেকে সুদীর্ঘ এই উদ্ধৃতির পর শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শকের কাছে এই মঞ্চচিত্রণের কোনো ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। শুধু বলা যায়, প্রচলিত বাস্তববাদের পথ সম্পূর্ণ পরিহারকরে মঞ্চচিত্রণ চলে যাচ্ছে এবার পুরোপুরি ইঙ্গিতধর্মিতার দিকে। রক্ত করবী নাটকের গঠনের মধ্যেই আছে এই ইঙ্গিতধর্ম--অধিকতর এবং গূঢ়তর বাস্তবে পৌঁছতে চায় বলে সে আমাদের মঞ্চসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে। রবীন্দ্রনাথেরঅতিপ্রিয় পালানাট্যের অখণ্ডতাকে অবলম্বন করে সে বস্তুত অনেক কাল ও অনেক স্থানের দ্বন্দ্বকে রূপ দিতে চায়। খালেদ চৌধুরী শম্ভু মিত্রের অনুপ্রেরণায় তাঁর আশৈশব শিল্পজ্ঞান নিয়ে কোনো বিদেশ রীতির তোয়াক্কা না করে সৃষ্টিকরে তোলেন সেই মঞ্চ-- দেখতে যাকে অতিবিশিষ্ট মনে হবে, অথচ যা বহুরূপীর সমগ্র অভিনয়রীতির অন্তর্গত সারল্যও প্রাণতাকে অনায়াসে ধারণ করতে পারে। মঞ্চচিত্রণ হয়ে ওঠে এক আদর্শ শিল্প, যার স্বতন্ত্র কোনো মহিমা চোখে পড়বে না, কিন্তু নাট্যের পরতে পরতে তার থেকে জেগে উঠবে নানা স্তর ও মাত্রা।

খালেদ চৌধুরী বলেন, রক্তকরবীর মঞ্চচিত্রণে তিনি যে বিমূর্ততাকে মূর্তির মধ্যে ধরতে চেয়েছিলেন, তার অনেকটাই তাঁর অবচেতনের সৃষ্টি। পরে ব্যাখ্যা করে তার মধ্যে তিনি কার্যকারণ সম্বন্ধে খুঁজে পান, এবং আজ তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন, শিল্পের পরিভাষায় ওটি ছিল এক্স্প্রেশনিস্টিক। অনেকে বলেছে, কিউবিস্ট---কিন্তু নো-- একেবারেই না। কারণ, ওটায় আবেগ তাড়িত হয়ে কাজ করা হয়েছে।... সেই আবেগ চিরাচরিত পন্থা, লাইন, সমস্ত কিছু--সব ভেঙে দিয়েছে। ২২ একই কথা তো বলা যায় রক্তকরবী-র রচনা - ইতিহাস প্রসঙ্গে। বছর খানেকের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ যে আমূল পালটিয়ে পালটিয়ে এই নাটক লেখেন, তার মূলেও কাজ করেছিল প্রকাশের সেই তীব্র আবেগ-- যা কিনা প্রচলিত নাটকের সমস্ত সংজ্ঞাকে ভেঙে দিতে পেরেছিল।

কিন্তু শুধু খালেদ চৌধুরী নন, আমরা বলতে পারি, আধুনিক বাংলা ও ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রেই রক্তকরবী-র মঞ্চচিত্রণ একটি বিপদসংকেত হয়েও দেখা দিয়েছিল। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্পীর স-জনের আবেগ ও ধর্ম শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পেঁছেছে--একজন শিল্পী আর একজন নির্দেশক যদি তাঁদের যাত্রারশুতেই সেইখানে পৌঁছে যান, তাহলে তাঁরা, কিংবা অন্যরা পরবর্তী সময়ে কোন পথে এগোবেন, এ যেন এক মহাসংকট হয়ে দেখা দেয়। শম্ভু মিত্রের পাশাপাশি উৎপল দত্ত (১৯২৯ - ১৯৯৩) যে সব মহানাটক প্রযোজনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাদের মঞ্চচিত্রণে আমরা সর্বদাই এক বিশালতা এবং ভারি স্থাপত্যের চেহারা দেখতে পাই। তাতে সংকেতধর্ম বা ইঙ্গিতবাহতার তুলনায় অভিভূত করে তোলার প্রবণতাই বেশি। আসলে ইংরেজি থিয়েটার দিয়ে যিনি যাত্রা শু করেছিলেন, ভিক্টোরীয় সংস্কৃতি যাঁর ধমনীতে, পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদ ও পিসকাটর তাঁকে প্রাণিতকরলেও নিজের কাজে চিরকাল তিনি দুয়ের সমন্বয় ঘটাবারই চেষ্টা করে গেছেন। কল্লোল নাটকে মঞ্চে খাইবার জাহাজ, ফেরারী ফৌজ এ জেটি নির্মাণ ও এক সঙ্গে একাধিক দৃশ্যতল নির্মাণ, অজেয় ভিয়েতনামে মাল্টি-মিড়িয়া সেট আপের মঞ্চ- বহির্মঞ্চ এবং ফিল্ম প্রোজেকশানের ব্যবহার -- তিতাস একটি নদীর নাম -এ মেল ও নদী থেকে তীরে নামার দৃশ্যে প্রসিনিয়মের সীমা অতিক্রম--এসবের মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যচিন্তার বিশালতাই ধরা পড়ে। থিয়েটারে দৃশ্য, আলো, ধবনি ও রূপারোপের প্রবলতর উপস্থিতি ছিল তাঁর প্রার্থিত। সেই প্রাবল্যই তাদের নান্দনিকতার সমর্থক --সূক্ষ্ম শিল্প রসচি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল না বলেই মনে হয়।

কিন্তু খালেদ চৌধুরী এরপর গূঢ়তর ব্যঞ্জনার দিকেই গেলেন। এবার আর অসচেনভাবে নয়, সচেতনভাবেই মঞ্চচিত্রণের বিন্যাসরীতিতে ভাঙচুর ঘটিয়ে। ইবসেন অবলম্বনে শম্ভু মিত্রের পুতুল খেলা একটি বাস্তববাদী নাটক হিসেবে পরিচিত। তিনি ডুব দিলেন নাটকটির অন্তর্লীন মনস্তাত্ত্বিকতায় - দেখতে পেলেন এ নাটকে আছে এক অদ্ভুত ট্রাজেডি, মানুষের ভেঙে পড়ার ছবি। নাটকের মূল চরিত্র নোরা (এক্ষেত্রে বুলু) ভাঙতে ভাঙতে এক সময়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সে চলে যাবার পর টরভাল্ড (তপন) ভেঙে পড়ে। মঞ্চের সমগ্র বিন্যাসে তাই তিনি ব্যবহার করলেন কার্ভলাইন। ছোট থেকে বড় জিনিসের মধ্যে সেই কার্ভ লাইন যেন ঢেউ খেতে খেতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে যায়। মূল এই ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে পিছনের কালো পশ্চাদ্পটে পিছনে শুধুমাত্র বস্তুসংস্থান যেন সেই লাইনগুলিকে আরও প্রকটিত করে -- তার সঙ্গে দেখা যায় নাটকের নানা দৃশ্যে বিছানার চাদর ও ঘরের পর্দার রঙের বদল হয়ে নাটকের সেই অন্তর্লীন বেদনার মাধুরীকে যেন আরও ব্যঞ্জিত করছে।

বাস্তববাদের মধ্যেই এই প্রতীকী সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রশতবর্ষে শ্রী চৌধুরী সবিতাব্রত দত্তর রূপকারগোষ্ঠীর কালের যাত্রা-র

মঞ্চচিত্রণ করেন পুনরায় প্রথাভাঙা সংকেতরীতিতে। এ নাটকে আছে সামাজিক মুক্তির বার্তা-- আছে সময়ের সঙ্গে তার যোগ, তাই মঞ্চের একদিকে আছে স্বস্তিকাচিহ্নবাহী মন্দিরের নিছক কঙ্কাল -- মাঝখানেবিরাটাকার বালুঘড়ি --যার মধ্য দিয়ে নাট্যউপান্তে প্রবেশ করবে শূদ্রের দল। মঞ্চবামে ঝুলছেকত ওলোনযন্ত্র--যা কেবল শূদ্রের শ্রমিকসত্তার প্রতিনিধি নয়, সমাজের ঋজুতার মাপকাঠি। কিন্তু ব াস্তবে পরিচিত কিছু বস্তুর ইচ্ছাকৃত এই অতিবাস্তবিক ব্যবহার তখনকার দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

৫

আজও হয় না। যে খালেদ চৌধুরী মঞ্চচিত্রণকে স্বতন্ত্র কোনো শিল্পের মর্যাদা দিতে নারাজ, নিজেকে যিনি '২স্তু দ্রনস্তুপ্তন্দ্বজ' বলতে অভ্যস্ত, সেই তিনিও তাঁর প্রায় পঁচাত্তরটি মঞ্চচিত্রণের কাজ করবার পর অনুভব করেন, আজও এই কাজটির সঠিক মূল্যায়নে অভ্যস্ত নয় বাংলা থিয়েটার, হয়তো এখনও --থিয়েটারের বিবর্তনের সমান্তরালে মঞ্চচিত্রণের বিবর্তন ইতিহাস ব্যাখ্যানের পরেও আমরা মঞ্চচিত্রীকে নির্দেশকের ইচ্ছাধীন মিস্ত্রি বলেই ভাবতে অভ্যস্ত।

তবু খালেদ চৌধুরী তাঁর কাজে থিয়েটারের স্বার্থসাধনের ফাঁকেই তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধ ও সৃজনের ক্ষেত্র খুঁজে নেন। তাঁর প্রায় পাশাপা শি বাংলা থিয়েটারে নির্মল গুহ রায়, মনু দত্ত, সুরেশ দত্ত, তড়িৎ চৌধুরী, বিভাস চত্রবর্তী, দেবাশিস মজুমদার প্রমুখ অনেকেই এই শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। অতি সম্প্রতিকালে সঞ্চয়ন ঘোষ নামে একজন তণ অনেক সংখ্যক নাটকের মঞ্চচিত্রণ করেছেন। তার মধ্যে বেশ কিছু কাজ অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ মনে হয়, অত্যন্ত আধুনিক হয়ে ওঠে -- কখনো কখনো তাঁর ভাবনা আবার নাটককে ছাপিয়েও যেতে চায়। বিশেষ করে, বিমূর্ততার দিকে যাবার তাঁর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে. সেক্ষেত্রে এই নাট্যসীমার বাইরেই তাঁর কাজ চলে আসতে চায় বলে মনে হয়। তবে তিনি প্রকৃতই প্রতিভাবান, আরও কাজ তাঁকে তাঁর স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে বলেই মনে হয়।

শেষ করা যায় খালেদ চৌধুরীরই একটি সাম্প্রতিক কাজের নমুনা দিয়ে। কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র প্রযোজিত জসিমুদ্দিনের নক্‌শি কাঁথার মাঠ নাট্যে শ্রী চৌধুরী ঊর্দ্ধমঞ্চের ডানদিকে ছোট একটি পাটাতনের সামনে ঝুড়ি আর চাটাই বাঁশের গায়ে লাগিয়ে গাছের ছবি রচনা করেন। মঞ্চের মাঝে, উপরে ঝোলে একটি নক্‌শি কাঁথা, যার বিন্যাস যেন সঙ্গোপনে এক নৌকার অনুষঙ্গ আনে। আর একটি মাত্র বঁ াশের গায়ে চিত্রিত শোভা কখনো বাড়ির দাওয়া, কখনো অন্য কিছু হয়ে অভিনেতৃদের হাতে প্রাণ পেয়ে যায়। আধুনিক নাট্যে মঞ্চচিত্রণ এই চিত্রধর্মের পরিমিতি এবং সৌন্দর্যই দাবি করে-- যেন সে শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলায় না চোখ। যে ভিক্টোরীয় মঞ্চরীতির অনুকরণে বাংল া থিয়েটার তার যাত্রা শু করেছিল, অনেক দিন পর্যন্ত তা আমাদের মঞ্চকে শাসন করেছে। গত শতাব্দীর শুতে এর থেকেমুক্তির আক াঙক্ষা জন্ম নিল। সেই মুক্তির পথের দিশাও খুঁজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তা, ক্রেগীয় সাংকেতিকতা বা রাইনহার্টের সংগঠনবাদ অভিমুখী নয়। শম্ভু মিত্র ১৯৬৪- তে যে রাজা অয়দিপাউস করে, অনিল ব্যানার্জী - কৃত মঞ্চে তার স্থাপত্যরীতিকে ক্রেগপন্থী বলে ভাবা যায়, খালেদ চৌধুরীরও বর্বর বাঁশি বা সাম্প্রতিক তখন বিকেল -এর মতো নাটকে সংগঠনবাদী রূপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তৃপ্তি যে নান্দনিক চেতনায়, তার রূপ দেখা যায় তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত ডাকঘর বা কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের চিলে কোঠার সেপাই- তে। এসব প্রযোজনা তাদের আপাতফর্মালিস্ট চেহারাকে ছাপিয়ে জীবনের একটি চিত্রিত সুন্দর (ডাকঘর) এবং আদিম বাস্তব (চিলে কোঠার সেপাই)- কেই জাগরিত করে। আর তা যে অনায়াসে সম্ভব হয়, তার কারণ এমন শিল্পীর মনের তার বাঁধা হয়ে গেছে এক দেশকাল সময় সংলগ্ন ভারতীয়তার সুরে। নক্‌শি কাঁথার মাঠ -এ তারই প্রকাশ।

আমাদের থিয়েটারের মতো তার মঞ্চচিত্রণেও চাই সেই ভারতীয় নান্দনিকতার উদ্বোধন।

উৎস ও টীকা

১. দৃশ্যপট বা সীন -এর ব্যবহার গ্রীসে ইসকাইলাস এবং সোফোক্লেসের নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছিল। রোমে যখন মঞ্চের মাথায় উপর ছাদ দেবার ব্যবস্থা হয়, তখন থেকে দৃশ্য পরিবর্তনেরও ব্যবহার হয়। একটা সীন হয়ে গেলে তা নীচে একটা নালায় পড়ে যেত, ওপর থেকে নেমে আসত পরের সীন। কিন্তু এসবের সঙ্গে প্রসিনিয়ম মঞ্চরীতি কোনো মিল নেই।

২. এখানে বলা দরকার, ১৫৮৯ র মে মাস জুয়ে প্রথম গ্রাণ্ড ফার্দিনান্দের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে উৎসব চলে, তাতেই প্রথম অপেরা-র আ বিষ্কার হয়। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চস্থাপত্যের ইতিহাসেও নানা বদল ঘটে যায়। এই সূত্রে মঞ্চস্থাপত্যশিল্পে ছবি আঁকা এংব খোদ াইয়ের কাজ, দুই চলে আসে।

৩. বিয়োগপঞ্জী ডেভিন, পিসকাটর, এঙ্গেল, ক্রেগ, বহুরূপী ২৬, অক্টোবর ১৯৬৬, অজিষ্ণু ভট্টাচার্য (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), গঙ্গাপদ বসু (সম্পা)।

৪. মঞ্চস্থাপত্য, সায়ক বক্তৃতামালা / ১,১৩ এপ্রিল ১৯৯৫, ৫বর্ষ অক্টোবর ৯৬, খালেদ চৌধুরী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য সম্পা.।

৫. পূর্বোক্ত।

৬. প্রাচীন নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই মঞ্চবেদি ও রঙ্গগৃহ - রঙ্গপীঠের ইতিহাসও অত্যন্ত আকর্ষনীয়। এর জন্য দেখা যেতে পারে প্রাচীন নাট্য

প্রসঙ্গ, ১৩৭৭, অবন্তীকুমার সান্যাল, কণা প্রকাশনী, রঙ্গমঞ্চ স্থাপত্য, ১৯৯০, কৌশিক সান্যাল, গণমন প্রকাশন ইত্যাদি বই এবং পবিত্র সরকারের নাটমঞ্চ নাট্যরূপ (১৩৮৮, প্রমা) গ্রন্থেব প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ও রঙ্গালয় প্রবন্ধ।

৭. Introduction to Bharata's Natya – Sastra, 1966, Adya Rangacharya, Popular Prakashan.

৮. রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র - প্রবন্ধ, র-র ১৩৯৩, সুলভ ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী।

৯. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৩৯৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ -এ পৃ ১৫ দ্রষ্টব্য, যেখানে বলা হয়েছে মি. লেবেদেফের নতুন থিয়েটার ডোমটোলায় অল্পদিনের মধ্যে খুলতে যাচেছ, যা /ডডন্দ্বন্তুপ্সক্তব্রন্দ্বস্তু ন্দ ব্রড়ন্দ্ব চন্দ্রুন্ত্রপ্তন্দ্বন্দ্ব ত্রব্রগুপ্তন্দ.*

১০. পূর্বোক্ত।

১১. পূর্বোক্ত।

১২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩৭৬, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রকাশন।

১৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৩৯৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। তখন থেকেই পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রসিনিয়মের দুই পাশে গ্যাসের বাতির চল হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বর্তমান নিবন্ধকার রচিত অপূর্ব গোলাপ নাটকে যেহেতু উনিশ শতকীয় থিয়েটারের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, তাই মৎ-পরিচালিত, অনুভাষ গোষ্ঠী প্রযোজিত ওই নাটকে ঊর্দ্ধমঞ্চে পাটাতনের দুধারে প্রসিনিয়ম আর্চ বিন্যস্ত করেছিলেন মঞ্চচিত্রী খালেদ চৌধুরী এবং আলোকশিল্পী বাদল দাস। তার গায়ে লাগিয়েছিলেন গ্যাসের বাতি।

১৪. ঘরোয়া, ১৩০২, অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রকাশ ভবন।

১৫. অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রযোজনা পদ্ধতি, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, অজিতকুমার ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৪, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা)।

১৬. কিছুদিন আগে, এফ. এম চ্যালেন প্রসিদ্ধ আলোকশিল্পী শ্রী তাপস সেন পণ্ডিত রবিশঙ্করের সৃষ্টি আবহের সঙ্গেঅঙ্গার নাটকের খনিতে জল ঢোকার দৃশ্য রচনার অভিঘাত ব্যাখ্যা করেছিলেন। তখন টেলিফোনে এখন দর্শক- শ্রোতা বারবার সেতু নাটকে তাঁর সৃষ্ট আলোয় মঞ্চে রেলগাড়ি দেখবার মুগ্ধ স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। শ্রী শম্ভু মিত্র লিখিত ভেজালের ঐতিহ্য নামের এক নিবন্ধসূত্রেও জানা যায়, বহুরূপীর রক্তকরবী নাটকে এক দৃশ্যে তাপস সেন আকাশপটে মেঘের ছায়া দেখাতেন যন্ত্রের সাহায্যে। ওই যন্ত্রটি মেঘকে সচল করতেও পারত, কিন্তু সে, বাড়াবাড়ির প্রয়োজন হত না। মুম্বইয়ের এক অভিনয়ের শেষ বিদেশি প্রতিনিধিদলের দর্শকরা নাটকের শেষে ওই যন্ত্রটি দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রী মিত্রর মনে হয়েছিল, তিরিশ বছব আগে ওদের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি বাঙালি নাট্যকর্মীরা আজ ব্যবহার করেছে বলে বোধহয় ওরা কৌতূহল বোধ করেছিলেন। ঘটনাটি শ্রী মিত্রকে ব্যথিত করেছিল। অথচ তাঁরা সবসময়েই চেয়েছিলেন কারিগরি কৌশলকে শিল্পসম্মত নাট্যাভিনয়ে গভীর আবেগ প্রকাশের কাজে লাগতে তাঁর নানা নাট্যকর্মে তার অনেক দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে।

১৭. রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগ অন্তরের ছন্দ নিবন্ধে, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, শেখর সমাদ্দার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৪, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা)

১৮. আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৩৮২, আশা প্রকাশনী, অমিতাভ দাশগুপ্ত (সম্পা)।

১৯. এই নিবন্ধগুলি ছাড়াও অভিনয়, পরিচালানা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা সতু সেনের নিবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে সংসৃতি পত্রের দ্বিতীয় বার্ষিকী সংখ্যায় ১৯৯৮, সম্পাদনা দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

২০. শম্ভু মিত্রের নাট্যসমাধনা, নাট্যপত্র স্যাস, ১৯৯৭, সত্য ভাদুড়ি (সম্পা) ও নাট্যশিক্ষক শম্ভু মিত্র, ১৯৯৯ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা,৫, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা)। শম্ভু মিত্র নির্মাণ ও সৃজন, ১৯৯৯ বইমেলা,কুমার রায়, প্রতিক্ষণ।

২১. নির্মাণের ইতিহাসে, সৃজনের কথায়, জুলাই ২০০১, খালেদ চৌধুরী, নাট্যপত্র ঘরে বাইরে, ১ম বার্ষিকী সংখ্যা, শেখর সমাদ্দর (সম্পা)।

২২. শিল্পের সন্ধানে, থিয়েটারে শিল্পভাবনা, বইমেলা ১৯৯৭, খালেদ চৌধুরী, প্রতিক্ষণ।